এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০২

মেলবোর্ন আর এডেলেইডের সময়ের পার্থক্য আধঘন্টা। আমার হাতঘড়ির সময় আধঘন্টা পিছিয়ে দিতে হলো। বাস থামলো সেন্ট্রাল বাস স্টেশানে। এখানেই গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাল। স্ট্রিটের নাম ফ্রাংকলিন স্ট্রিট। মজার ব্যাপার হলো মেলবোর্নেও গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাল ফ্রাংকলিন স্ট্রিটে। স্যার জন ফ্রাংকলিনের নামে বেশ কয়েকটা জায়গার নামও আছে অস্ট্রেলিয়ার এখানে সেখানে। ফ্রাংকলিন সাহেব ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তাসমানিয়ার গভর্নর ছিলেন।

বাস থেকে নেমেই চোখে পড়লো রাস্তার মাঝখানে বেশ কিছু নারীপুরুষ হাতে প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে কোন মিছিল টিছিল নাকি? না, প্লাকার্ডে বিভিন্ন হোটেল, লজ আর ইয়থ হোস্টেলের নাম লেখা। তাদের পেছনে রাখা বিভিন্ন রঙের বিজ্ঞাপন সজ্জিত বেশ কিছু মাইক্রোবাস চোখে পড়লো। এডেলেইডে যারা নতুন তাদের জন্য বেশ ভালোই অভ্যর্থনার আয়োজন। অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই ব্যবসায়িক। আমার থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তাই এখানে কারো সাথে কথা বলার দরকার নেই আমার।

স্থানীয় সময় সকাল সোয়া সাতটা এখন। রবিবার। ছুটির দিনের সকাল। শহর জাগবে আরো অনেক পরে। আমাকে যেতে হবে রয়েল এডেলেইড হসপিটালের আবাসিক এলাকায়, হোস্টেলে। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস টার্মিনাল থেকে বেরুনোর পরে মনে হলো একটা ম্যাপ নিলে ভালো হতো। কিন্তু আবার টার্মিনালের ভেতরে গিয়ে ম্যাপ নিয়ে আসতে আলস্য লাগছে। বুঝতে পারছি না এখান থেকে ঠিক কতো দূরে রয়েল এডেলেইড হসপিটাল। ট্যাক্সিতে চাপার ইচ্ছে হলো।

এখানকার ট্যাক্সির রং সাদা। হোয়াইট ক্যাব। আমার ট্যাক্সির ড্রাইভারের গায়ের রং আমার মতোই। পরিচয় পত্র গাড়ির ভেতর লাগানো আছে কোথাও, এখন দেখতে ইচ্ছে করছে না। ভারতীয় বা শ্রীলংকান হতে পারেন তিনি। বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। অনেকদিন আছেন হয়তো এডেলেইডে। আমার গন্তব্য শুনেই ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটালেন। মনে হচ্ছে অনেক দূরের পথ।

দিক সম্পর্কে আমার ধারণা সবসময়েই কাঁচা। সুতরাং কোন্‌দিকে যাচ্ছি তা ভেবে সময় নষ্ট করার মানে হয়না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছি। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া। মেলবোর্ন সিটির রাস্তার চেয়েও বড়। কয়েকটা বহুতলা ভবন ছাড়া প্রায় সবগুলো বিল্‌ডিংই পুরনো

স্থাপত্যের। দেখে মনে হচ্ছে দেড়শো দু'শ বছরের পুরনো কোন শহরে এসে পড়েছি। অবশ্য আমি জানি এই পুরনো ভবন গুলোকে এরকম 'পুরনো' করে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করা হয় প্রতিবছর।

প্রায় বিশ মিনিট পরে ট্যাক্সি থামলো বিশাল এক ভবনের সামনে। এসে গেছি। রয়েল এডেলেইড হসপিটালের আবাসিক এলাকায় বিশাল হোস্টেল। ট্যাক্সির মিটার বলছে 'আট ডলার পঁয়ত্রিশ সেন্ট'। অস্ট্রেলিয়াতে টিপ্স দেয়াটা খুব একটা প্রচলিত নয়। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রিসেপশানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভেবেছিলাম রিসেপশানে কেউ থাকবে না এত সকালে। কিন্তু না, চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে এই কাউন্টার। নাম বলতেই ভদ্রমহিলা 'এ আই পি কন্‌ফারেনস' লেখা মোটা একটা খাতা বের করলেন। কম্পিউটারের বদলে খাতার ব্যবহার দেখে একটু অবাক হলাম। দু'মিনিটের ভেতর রুমের চাবি আর একটা ফোল্‌ডার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন,
- ডান দিকের লিফ্‌ট ধরে সোজা দশতলায় উঠে যান। ১০৩২ নাম্বার ঘরে থাকবেন আপনি। হ্যাভ এ নাইস স্টে।

এই বিল্‌ডিংটা বারোতলা। দশতলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে ডান দিকের অংশ বা রাইট উইংস এর বাম দিকের সারির দ্বিতীয় ঘরটা আমার। ধবধবে সাদা বিছানা। জানালার ভারী পর্দা সরাতেই সূর্য যেন ঘরে ঢুকে পড়লো। বুঝলাম এটা পূর্বদিক। আধঘন্টা আগে যে সূর্য কোমল সোনালী ছিলো এর মধ্যেই সে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। এই সকালবেলাতেই যে হারে গরম পড়ছে, সারাদিনে তাপমাত্রা কত উঠবে কে জানে।

পিঠটা ব্যথা করছে। ব্যাগটা অন্যায় রকমের ভারী হয়েছে। কনফারেন্‌সে বক্তৃতার ঠেলায় কিছু বইপত্র আনতে হয়েছে সাথে। আর বুকের ডান পাশেও কিঞ্চিৎ ব্যথা। জেনির মাথাটাতো কম শক্ত নয়। বিছানায় শুয়ে একটু দোল খেয়ে নিলাম। এই খাটের স্প্রিংগুলোর স্প্রিং কনস্ট্যান্ট নিশ্চয় খুব বেশি। আচ্ছা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বেশি হলে ইলাস্টিসিটি বাড়ে না কম হলে বাড়ে? না, এই ক্ল্যাসিক্যাল ম্যাকানিক্সের ভূত আমাকে ছাড়বে না দেখছি।

শুয়ে শুয়ে রিসেপশান থেকে দেয়া ফোল্‌ডারটা খুললাম। হোস্টেলের কিছু নিয়ম কানুন লেখা আছে। এই আবাসিক হোস্টেলের পুরোটাই ধূমপান মুক্ত এলাকা। প্রত্যেক রুমে স্মোক এলার্ম লাগানো আছে। এলার্ম বাজলে সাথে সাথে ফায়ার ব্রিগেডে খবর চলে যাবে আর তারা ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চলে আসবে। ধূমপান জনিত কারণে ধোঁয়ার উৎপত্তি বুঝতে পারলে ৩২০ ডলার ফাইন। ফাইনটা তিনশো বা সাড়ে তিনশো না হয়ে ৩২০ হলো কেন কে জানে। রাত বারোটা পনেরো মিনিটে মেইন গেট বন্ধ হয়ে যায়। তবে ফোন করে যে কোন সময় দরজা খোলার ব্যবস্থা করা যাবে। এরপরে কিচেন, টিভিলাউঞ্জ ইত্যাদি ব্যবহারের নিয়ম কানুন। এতকিছু পড়ার ধৈর্য আমার নেই। রেখে দিলাম ফোল্‌ডার। বিপদে না পড়লে এই ফোল্‌ডার আর খুলে দেখা হবে না।

স্নানটা সেরে ফেলা দরকার। তারপর বেরিয়ে পড়া উচিত। বিকেল চারটায় কনফারেন্স রেজিস্ট্রেশন। তার আগে হাতের সময়টাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগানো উচিত। আমার রুমের ঠিক পাশের রুমটা হলো কিচেন। বেশ বড়। ফ্রিজ, কুকার, মাইক্রোওভেন ইত্যাদি সব আধুনিক গ্যাজেটে ভর্তি। কিচেনের পাশের রুমটা টয়লেট ও বাথরুম। ডানপাশে একসারি টয়লেট, বামপাশে একসারি বাথরুম, সামনে পরপর তিনটি বেসিন। সবকিছু ঝকঝকে পরিষ্কার। দুটো বাথটাবও দেখা যাচ্ছে। আর কী চাই! বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে শেভিং ফোম লাগাতে লাগাতে আপন মনে গুন গুন করছি। হঠাৎ সামনের আয়নায় দেখা গেলো এক নারীমূর্তি। শরীরে বসন যা আছে তা না থাকারই সমতুল্য। আমি তো কাঠ হয়ে গেছি। ভুল করে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকে পড়লাম না তো? কিন্তু দরজায় তো কোন ধরণের লেখা বা চিহ্ন চোখে পড়েনি।

অস্ট্রেলীয় তরুণীটির কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। আমাকে যেন দেখতেই পায়নি সে। অথচ আমার হাত ছোঁয়া দূরত্বে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে। আমি কী করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। এরকম বিপদে তো আগে কখনো পড়িনি। শেভ করার এই মাঝপথে বেরুনোরও কোন উপায় নেই। আবার যন্ত্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও তো কোন কাজ হবে না। আয়নায় মেয়েটির সাথে চোখাচোখি হতে সে মুখে ব্রাশ গোঁজা অবস্থাতেই হাসলো একটু। আমি হাসবো কি - রীতিমতো কান্না পাচ্ছে আমার। তবুও সারামুখে ফোম লাগানো বলে মেয়েটি আমার মুখের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেনা। এসময় আরেক জন পুরুষ মানুষকে ঢুকতে দেখে শরীরে প্রাণ ফিরে পেলাম। এই বাথরুম তাহলে পুরুষ মহিলা সবার জন্য। অস্ট্রেলিয়ায় এ পর্যন্ত যেখানেই গিয়েছি পাবলিক প্লেসে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা বাথরুম ও টয়লেটের ব্যবস্থা দেখেছি। এই প্রথম দেখলাম বাথরুমেরও লৈঙ্গিক বিভাজন উঠে যেতে। এটা ভালো কি মন্দ তা বলতে পারবো না। তবে অপরিচিত একজন প্রায় নগ্ন তরুণীর পাশে দাঁড়িয়ে শেভ করতে আমার ভীষণ সংকোচ লাগছিলো।

নিচে নেমে লাউঞ্জেই পেয়ে গেলাম এডেলেইডের ম্যাপ। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ। আকর্ষণীয় স্থানের বিবরণ। কখন কোথায় কীভাবে যেতে হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি। হোস্টেল থেকে বেরুতেই কাঠের বেড়া দেয়া একটা ঘর চোখে পড়লো গাড়ি পার্কিং এর মাঝখানে। ভাবলাম গাড়ির পার্কিং টিকেট দেয়া হয় হয়তো । কিন্তু না, ওটা আসলে ''স্মোকার্স''। বিড়িখেকোদের জন্য পাঁচটি ঘরের এটা একটি। এরকম ঘরে বসে চোরের মতো লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকতে হবে ভাবলেই তো বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু যারা বিড়ি খায়, বিড়ি খাওয়ার ব্যাপারে তাদের মান অপমান জ্ঞান অতটা কড়া নয়।

হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরুতেই বাম দিকে রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন। রবিবারেও সারাদিন খোলা থাকে। অবশ্য পার্ক আর দর্শনীয় স্থানগুলো সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খোলা থাকাটাই নিয়ম। ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনটা ঘুরে দেখলাম। বেশ বড়। অনেক প্রজাতির গাছে ভর্তি। গাছের সাথে পরিচিতি মূলক তথ্য দেয়া আছে। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের বিপুল সমাবেশ এখানে। একটি কাচের ঘর বা গ্রীন হাউজে রাখা আছে সব। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে যে সব গাছের নাম রাত জেগে মুখস্থ করে সকাল বেলা ভুলে গিয়েছি -

সেসব বিরল প্রজাতির সব ফার্ণই আছে এখানে। আহা - যদি সেসময় চোখে দেখতে পেতাম এগুলো - তাহলে হয়তো ভুলতাম না আর কাজেও লাগতো। পতঙ্গাভুক উদ্ভিদ রাখা আছে লোহার গারদে ঢেকে। সেখানে লেখা আছে ''ডোন্ট ডিস্টার্ব''। বিশাল এলাকা জুড়ে গোলাপ চাষের নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কিছু কিছু গোলাপের সাইজ বড় হতে হতে পদ্মফুলের আকার ধারণ করেছে। বিশাল বিশাল স্টিল ও কাচের পাত লাগিয়ে কৃত্রিম রেইন ফরেস্ট তৈরি করা হয়েছে। এটার নাম বাইসেন্টেনিয়াল কন্‌জারভেটরি। খোলার সময় দুপুর বারোটা। বারোটা বাজেনি এখনো। ভেতরে ঢোকা হলো না আর। বাইরে জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা গেলো তাতে গভীর অরণ্যের আভাস। গহীন অরণ্যে যাবার সুযোগ বা সাহস যাদের নেই তাদের জন্য অরণ্যকেই ধরে এনে খাঁচায় পোরা হয়েছে এখানে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তাটার নাম দেখলাম নর্থ ট্যারেস। এবারে এডেলেইড সিটি ম্যাপটা খুলে দেখলাম। কোথায় আছি এখন। ইউনিভার্সিটিটা ঘুরে আসা দরকার। কনফারেন্সের স্থানটা চেনা থাকলে ভালো। এডেলেইড ইউনিভার্সিটি একদম কাছে। আট দশ মিনিটের হাঁটা পথ এখান থেকে। আমার হোস্টেল থেকে বড়জোর পাঁচমিনিট লাগবে। ফ্রোম রোডের পূর্ব পাশে এডেলেইড হাসপাতাল আর ছোট্ট রাস্তাটার পশ্চিম পাশেই ইউনিভার্সিটি। একই ক্যাম্পাসের ভেতর পাশাপাশি দুটো ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়া আর ইউনিভার্সিটি অব এডেলেইড।

কনফারেন্সের বক্তৃতাগুলো হবে এডেলেইড ইউনিভার্সিটির আটটি অডিটরিয়ামে। আমি প্লেনারী সেশান আর নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সেশানগুলোতে এটেন্ড করবো। ওগুলো হবে যথাক্রমে বনিথন হল আর ফিজিক্স বিল্‌ডিং এ। এডেলেইড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস আমাদের মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির পার্কভিল ক্যাম্পাসের চেয়ে অনেক ছোট। ক্যাম্পাসে একচক্কর দিতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগলো না। হয়তো আরো অনেক জায়গা এদের আছে যা আমি চিনি না এখনো।

ইউনিভার্সিটির ঠিক পাশেই আর্ট গ্যালারী অব সাউথ অস্ট্রেলিয়া। এই আর্ট গ্যালারী সপ্তাহের সাত দিনই খোলা থাকে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। কোন প্রবেশ মূল্য লাগে না এখানে। ঢোকার মুখেই সাদা মার্বেলের তৈরি বেশ কয়েকটি মূর্তি। গ্রীক ভাস্কর্য। নারী মূর্তির সংখ্যাই বেশি। রিসেপশানে ব্যাগ রেখে যাওয়া নিয়ম। আমার কাঁধের ব্যাগের আকৃতি খুব একটা বড় না হওয়াতে ব্যাগ নিয়েই ভেতরে ঢুকে যেতে অনুরোধ করলেন রিসেপশনিস্ট। বেশ উঁচু ছাদ। পরপর গ্যালারী গুলো সাজানো। গ্যালারী-১ থেকে শুরু করে গ্যালারী-২০ পর্যন্ত আছে। দেশ বিদেশের বিখ্যাত অনেক চিত্রকর্ম, শিল্পকর্ম রাখা আছে এখানে। নিয়ন্ত্রিত তাপ ও বৈদ্যুতিক আলো ছাড়াও কয়েকটা রুমে প্রাকৃতিক আলোও প্রবেশ করছে। এই রুমগুলোর ছাদ স্বচ্ছ সেলুলয়েডের তৈরি। ফলে আকাশ দেখা যায় ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে। প্রতিফলিত আকাশের একটা প্রভাব পড়ছে দেয়ালে লাগানো পেইন্টিংসের উপর। আর্ট গ্যালারী ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য সকাল এগারোটা থেকে প্রতি ঘন্টায় গাইডের ব্যবস্থা আছে। এদের ভাষায় গাইডেড ট্যুর। আমি ঢোকার সময়ে একটি গ্রুপকে নিয়ে গাইড ভেতরে ঢুকছিলেন। আমিও তাদের সাথে গ্যালারীর প্রথম কক্ষে ঢুকলাম। গাইড ভদ্রমহিলা যে

শিল্পকলা সম্পর্কে প্রচুর জানেন তা বোঝা গেলো তাঁর বর্ণনা থেকে। প্রতিটি শিল্পকর্মের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি। শিল্পকলার আমি বাইরের স্তরের সমঝদার, যাকে বলে সারফেস লাভার। উপরের আবরণের একটুও ভেতরে যাবার মতো বোধ বা ধৈর্য বা অধ্যবসায় এরকম আরো যা যা লাগে তার কোনকিছুই নেই আমার। সুতরাং গাইডকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম পুরো গ্যালারী।

কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পেইন্টিং এর ছবি তুলে নেয়ার প্রচন্ড ইচ্ছে হচ্ছিলো। যে কোন আর্ট গ্যালারীতে সাধারণত ছবি তোলা নিষিদ্ধ। ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতেও দেয়া হয়না। এখানে আমার ব্যাগে ক্যামেরা আছে, তারা চেক করেনি। চাইলে ছবি তুলতে পারি এখন। কিন্তু জেনে শুনে একটা অন্যায় কেন করবো? তাছাড়া আমি তো জানি কেন ছবি তোলা বারণ এখানে। প্রথমতঃ শিল্পীর কপিরাইট লঙ্ঘন করা হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম তাপ ও আলোক নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সংরক্ষণ করা আছে। ক্যামেরার ফ্লাশলাইটের তীব্র আলো শিল্পকর্মের জন্য ক্ষতিকর। আইন প্রয়োগ করার পরে তা মানানোর জন্য যদি লাঠিয়ালেরও ব্যবস্থা করতে হয় সর্বত্র, তাহলে চলবে কীভাবে?

সবকিছু খুটিয়ে দেখতে গেলে পুরোদিন লাগবে। আমার হাতে তত সময় নেই। দেখার পালা দ্রুত শেষ করে বেরোবার সময় দেখলাম গাইডেড ট্যুর গ্যালারী-১ শেষ করে গ্যালারী-২ তে ঢুকছে। আমার ইচ্ছে করছিলো ঐ গাইডকে গিয়ে একটা বিশেষ ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে। ছবিটা শেষের দিকের একটা গ্যালারীতে রাখা আছে। একটা ১মিটার × ২ মিটার কাঠের বোর্ড; সম্পূর্ণ কালো, চারপাশে লাল রঙের বর্ডার দেয়া। আর কিছু নেই কোথাও। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুল কলেজে এরকম ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা হয় কেবল লাল পাড়টি ছাড়া। এত যত্ন করে এই বোর্ড এখানে রাখার কোন মানে নিশ্চয় আছে। মানেটা কী? শিল্পকর্ম হয়তো একারণেই দুর্বোধ্য।

আর্ট গ্যালারী থেকে বেরিয়েই চোখে পড়লো সাউথ অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়াম। হালকা হলুদ রঙের বিশাল চারতলা বিলডিং। পুরোনো ধাঁচের স্থাপত্য। স্থাপত্যবিদ্যায় এধরনের স্থাপত্যের নিশ্চয় কোন গালভরা নাম আছে। মিউজিয়ামের নিচের তলায় ঢুকতেই চোখে পড়ে বিরাট এক তিমি মাছের কঙ্কাল। রিসেপশানের ঠিক পাশেই কেন এই কঙ্কালটা রাখা হয়েছে কে জানে। কঙ্কালের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে মাংস সহ তিমিটা একটা ছোটখাট পর্বতের সাইজের ছিলো।

গলায় প্রজাপতি টাই লাগানো সুদর্শন তরুণ অভ্যর্থনা জানালো সাউথ অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়ামে। এই মিউজিয়ামেও কোন প্রবেশ মূল্য লাগেনা। অমূল্য তথ্যভান্ডারকে এরা আক্ষরিক অর্থেই অ-মূল্যে সরবরাহ করছে। নিচতলার বাম দিকে তাসমানিয়ান টাইগারের একটা স্লাইড প্রদর্শনী চলছে। দেখতে অনেকটা শেয়ালের মতো এই প্রজাতিটি এখন বিলুপ্ত। ডান দিকের ঘরে রয়েছে ওয়ার্লড ম্যামাল। পৃথিবীর ভৌগোলিক অঞ্চল ভিত্তিক প্রাণিগুলোর নানা প্রজাতি'র নমুনা স্টাফ করে রাখা এখানে। প্রায় সব বিশিষ্ট প্রাণীই আছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের রয়েল বেঙ্গাল টাইগারকে দেখলাম না কোথাও। তার বদলে কিছু ইন্ডিয়ান দুর্বল

বাঘের নমুনা রাখা আছে।

ম্যামালের জগতের ঠিক পাশেই প্রদর্শিত হচ্ছে খনি থেকে পাওয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণখন্ড। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের পরে এটা সরিয়ে ফেলা হবে এখান থেকে। রেখে দেয়া হবে সিকিউরিটি ভল্টে। এই সোনার খন্ডটির ভর সাড়ে পঁচিশ কেজি। চল্লিশ মিলিয়ন বা চার কোটি বছরের পুরোনো এই খাঁটি সোনার কাছে দাঁড়ালেই ভেতরটা সোনা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার সেরকম কিছু হচ্ছে না।

পুরো দোতলা জুড়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর পাপুয়া নিউগিনির আদিবাসীদের বিভিন্ন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরেও এরকম কিছু সংগ্রহ আছে। আমাদের উপজাতীয়দের ব্যবহৃত জিনিস পত্রের সাথে এখানকার আদিবাসীদের জিনিস পত্রের অনেক সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তিনতলায় অস্ট্রেলিয়ান মাছ আর পাখির নমুনা। একটাও জীবন্ত প্রাণী নেই এখানে, সব স্টাফ করা। চারতলায় রয়েছে খনিজ সম্পদ আর প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন।

জাদুঘরের দোতলা থেকে একটা নিচু সিঁড়ি বেয়ে আলাদা একটা ভবনে যাওয়া যায়। এখানে অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক গ্যালারী। অত্যন্ত আধুনিক উপায়ে সংরক্ষিত সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে তাদের ইতিহাস। প্রত্যেকটি সংগ্রহ শ্রেণীর সাথে দেয়ালে লাগানো আছে ফ্লাট ডিজিটাল টেলিভিশন। সামনে গেলেই টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠছে একজন আদিবাসী নারী বা পুরুষের মুখ। তারা ভিডিওতে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে থাকে, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথাও।

দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের চলচ্চিত্র ভিডিওতে ধারণ করা রয়েছে। ইনফ্রারেড রে দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়ে যায় এসমস্ত ভিডিও, পর্দার সামনে গেলেই। এরকম একটা জাদুঘরে যে কেউ কিছুটা সময় কাটিয়ে বেরুনোর সময় দেখা যাবে নিজের অজান্তেই অনেক জ্ঞান সাথে নিয়ে বেরুবে।

আমার আশ্চর্য লাগে, যে সাদা অস্ট্রেলিয়ানরা এখন মরীয়া হয়ে কালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়েছে - এই তারাই একশ বছর আগে এই আদিবাসীদের মেরে সাফ করে দিতে চেয়েছে। কুকুরের মতো গুলি করে করে মেরেছে আদিবাসী দেখলেই। শেষে গুলির খরচ আর সময় বাঁচানোর জন্য আদিবাসীদের খাবারের লোভ দেখিয়ে বন্দী করে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন। সুখের দিনে দুঃখের অতীত মনে করতে নেই। কিন্তু সুখের দিনেই তো ''দুঃখের বাতাস বুকের কপাট নাড়ায়''। এই আদিবাসী সহজ সরল মানুষ গুলোর জন্য কষ্ট হয়। কিন্তু সমস্ত সভ্যতাই তো মানুষের কষ্ট দিয়ে তৈরি।

মিউজিয়ামের পাশেই রয়েছে সাউথ অস্ট্রেলিয়ান পাবলিক লাইব্রেরী। হাতে সময় কম আর পেটের ক্ষিধে বেশি হওয়াতে লাইব্রেরীতে ঢোকা হলো না এবেলা। রাস্তার ঠিক অপর পাড়েই রান্ডন মল। মায়-আর, ডেভিড জোন্স প্রভৃতি নামী দামী ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স আর ভূনিম্নস্থ

ফুড সার্কিট। ফুড সার্কিটে পৃথিবীর নানা দেশের খাবার সাজানো আর প্রচন্ড ভীড়। মেক্সিকান খাবার চেখে দেখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু প্রচন্ড ভীড় সেখানে। তাই ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডস নিয়ে বসে পড়লাম একদিকের একটা সিংগল টেবিলে। যে কোন দোকান থেকে খাবার কিনে যে কোন জায়গায় বসে খাওয়া যায়। প্রচুর চেয়ার টেবিল সাজানো রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবার কারণে সিট খালি পেতে একটু সময় লাগছে এখন।

শপিং মল থেকে একটা স্কেলেটার ধরে উপরে উঠে রাস্তায় বেরুলাম। কিং উইলিয়াম স্ট্রিট। তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা ইউলিয়াম ফোর্থ এর নামানুসারে এই কিং উইলিয়াম স্ট্রিট; এডেলেইড সিটিকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করে সোজা উত্তর দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে। এডেলেইট সিটির নামটাও রাখা হয়েছে এই কিং উইলিয়ামের বৌ কুইন এডেলেইডের নামে।

এডেলেইড সিটিটা ছোট। উত্তর দক্ষিণ বরাবর চারটে স্ট্রিট আর পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ছয়টা স্ট্রিট নিয়ে মূল সি-বি-ডি বা সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট বা মূল সিটি। হাঁটতে হাঁটতে সোজা টাউন হল পেরিয়ে দেখি ফ্রাংকলিন স্ট্রিট। একটু হাঁটতেই চোখে পড়লো বাস টার্মিনাল। গ্রেহাউন্ড এর কাউন্টার। এত দূরে চলে এসেছি! ম্যাপ খুলে দেখলাম মোটেও দূরে নয়। একদম কাছে। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো লাগবে এডেলেইড হাসপাতালের কম্পাউন্ডে পৌঁছাতে। ট্যাক্সিওয়ালা তাহলে আমাকে পুরো শহর ঘুরিয়ে নিয়েছে সকালে! কথায় আছে 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না মারিলে আর কে মারিবে!' কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাটা কি বাঙালি ছিলো? মেজাজটা অনাবশ্যক খারাপ হয়ে গেলো। ঘড়িতে বাজে তিনটা। রুমে চলে এলাম। টার্মিনাল থেকে হেঁটে আসতে মোট সময় লাগলো সতেরো মিনিট। সকালে ট্যাক্সিতে লেগেছিলো বিশ মিনিট। মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেলো।

মেজাজ খারাপ থাকলে কি তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে? বিছানায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য শুয়ে উঠলাম দেড় ঘন্টা পর। ঘড়িতে বাজে পাঁচটা। জিন্‌স আর টী-শার্ট পরে শুয়েছিলাম। কন্‌ফারেনসে এই পোশাকে যাওয়া চলে না। যতই এদেশে পোশাক সম্পর্কে উদাসীনতা থাকুক না কেন - কন্‌ফারেনসে নিশ্চয় সবাই বেশ ভদ্র পোশাকে আসবে। আমিও ইস্ত্রি করা শার্ট প্যান্ট বের করে জুতো জোড়া আরো চকচকে করে মচ মচ করে বেরুলাম।

ঠিক কোথায় যেতে হবে তা সকালে এসে চিনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন টার্নিং পয়েন্টে কন্‌ফারেনসের ম্যাপ সেঁটে দেয়া হয়েছে। একজন আনাড়িও তীর চিহ্ন অনুসরণ করে পৌঁছে যেতে পারবে গন্তব্যে। আমাকে যেতে হবে ইউনিয়ন বিল্‌ডিং এর নিচের তলায়। এডেলেইড ইউনিভার্সিটিটি বেশ কয়েকটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ইউনিয়ন বিল্‌ডিংটি একটি পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে। ফলে নিচের তলাটা হলো পাহাড়ের নিচে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আর ইউনিয়ন বিল্‌ডিং এর চারতলা আর পাঁচতলায় পাহাড়ের ওপর দিয়ে সরাসরি ঢোকা যায়। ফিজিক্স বিল্‌ডিং টা পাহাড়ের ওপরে। ফলে ফিজিক্স বিল্‌ডিং এর নিচের তলা ইউনিয়ন বিল্‌ডিং এর ছয়তলার সমতলে।

ফিজিক্স বিল্‌ডিং এর দিক থেকে নিচের দিকে নামছি। প্রশস্ত লাল সিঁড়ি। মাঝপথে দেখা হয়ে

গেলো মেলবোর্ন গ্রুপের সাথে। ওরে বাপুরে! সবাই দেখি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে চলে এসেছে। কন্‌ফারেনসের পোশাকের মর্যাদা রক্ষার সমস্ত দায় দায়িত্ব দেখি আমিই ঘাড়ে তুলে নিয়েছি। তাদের হাতে কন্‌ফারেনস ব্যাগ। তার মানে তারা রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের কাজ সেরে ফেলেছে। পার্টিক্যাল ফিজিক্সের মেয়ে র‍্যাছেলের চেহারার সাথে এক্স-ফাইলের স্ক্যালির চেহারার মিল আছে। সেটা আমাদের সাথে সাথে র‍্যাছেলও জানে। তাই তার চলনে বলনে একটু বেশি রকমের স্মার্টনেস দেখা যায় সব সময়। এখন সে যেটা পরে আছে সেটাকে হাফ প্যান্ট বলা চলে না, সেটা বড়জোর কোয়ার্টার প্যান্ট। আর গায়ে সেরকমেরই সংক্ষিপ্ত একটা গেঞ্জি। প্লেনে এসেছে এরা। এই পোশাকেই কি তারা প্লেনে বসেছিলো? কে জানে। র‍্যাছেলের সাথে চোখাচোখি হতেই সে বললো,

- প্রাডিব তুমি কফি খেতে যাবে?
- না, আমার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি এখনো।
- তাহলে তুমি নিচে যাও। সেখানেই থেকো, আমরা কফি খেয়েই চলে আসবো।

নিচে নামতেই দেখা হলো প্রফেসর স্টুয়ার্ট টোভির সাথে। ভদ্রলোক নামকরা এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট। কেমব্রিজ থেকে পি-এইচ-ডি করে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে চুল পাকিয়েছেন। তিনিও দেখি হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি আর চপ্পল পরে চলে এসেছেন। নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগছে এখন। আর সবার পোশাক দেখেই হয়তো খুব গরম লাগতে শুরু করেছে আমার।

ইউনিয়ন বিল্‌ডিং এর নিচের তলায় রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক। পেছনে কনফারেনস ব্যাগের বিরাট পাহাড় নিয়ে বসে আছে পাঁচজন অল্পবয়সী মেয়ে। রেজিস্ট্রেশন এসিস্ট্যান্ট। 'এ' থেকে 'ডি' এর কাউন্টার হলো ডেস্ক নাম্বার ওয়ান। এই 'এ' থেকে 'ডি' মানে হলো নামের পদবীর আদ্যাক্ষর। আগে আমি পদবীটাকে নামের সাথে ঝুলে থাকা একটা অপ্রয়োজনীয় লেজ মনে করতাম। দেশের বাইরে এসে দেখি সবাই এই লেজ ধরেই টানাটানি করে। যদিও অস্ট্রেলিয়াতে সবাই সবাইকে নাম ধরেই ডাকে। যেমন প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডকেও মিস্টার হাওয়ার্ডের বদলে জন বা জনি বলে ডাকা যায়।

আমার কন্‌ফারেনস ব্যাগ পেয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর রাজ্যের কাগজ পত্রে ঠাসা। নেমট্যাগ - যা বুকে লাগিয়ে রাখতে হবে কন্‌ফারেনসের সবটুকু সময় ধরে। তাতে সুবিধা এই - কাউকে আর ঘটা করে নিজের নাম, কোত্থেকে আসছি এসব বলতে হবে না। কন্‌ফারেনস হ্যান্ডবুক - যেখানে প্রত্যেকটি টক্‌ আর ইভেন্ট এর সময়সূচি সুনির্দিষ্ট ভাবে দেয়া আছে। কন্‌ফারেনস এব্‌স্ট্রাক্ট বুক - যেখানে রয়েছে এই কনফারেনসে যতগুলো পেপার উপস্থাপন করা হবে সবগুলোর সারমর্ম। আমি এব্‌স্ট্রাক্ট বুক খুলেই নিজের পেপারটা দেখে নিলাম। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; গ্রুপ ছবি দেখার সময় যেমন প্রত্যেকে নিজের মুখটা কোথায় আছে, কেমন আছে আগে দেখে নেয়। ব্যাগে আরো আছে এডেলেইডের ম্যাপ। সিটি গাইড এবং একগাদা বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানাচ্ছে তাদের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য। কিছু বিজ্ঞাপন আছে চাকুরীদাতাদের। সেখানে বলা হচ্ছে তারা আকর্ষণীয় বেতন দেবে, সুযোগ সুবিধা দেবে ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা যেন তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ব্যাপারে একটু বিবেচনা করে দেখেন।

একদিকে হাজার হাজার মানুষ চাকুরি পাচ্ছেনা, আর অন্যদিকে চাকুরিদাতারা ঘুরছে যোগ্যতমদের পেছনে। ডারউইন সাহেব 'সার্ভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' লেখার সময় কি এতসব বিবেচনায় এনেছিলেন? এই সোনালী রূপালী ঝলমলে বিজ্ঞাপন গুলো ফেলে দিতে সামান্য মায়া হচ্ছিলো। কিন্তু জঞ্জাল যত আকর্ষণীয় মোড়কেই সাজুক না কেন সে তো জঞ্জালই। দেখলাম রিসাইক্লিং বিন দ্রুত ভরে যাচ্ছে এই উচ্ছিষ্ট বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপন দাতারা ঠিকই জানেন যে এগুলির এরকম পরিণতি হবে। এবং এটাও জানেন যে এর মধ্য থেকেই অনেকের টেলিফোন পাবেন তারা।

দেখতে দেখতে আমরা মেলবোর্নের গ্রুপটা বেশ বড় হয়ে গেলাম। সারা অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সবগুলি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সের বিভিন্ন শাখার পি-এইচ-ডি স্টুডেন্ট, পোস্ট ডক্টরেট ফেলো আর প্রফেসররা এসেছেন। এসেছেন নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড আর আমেরিকা থেকে। পাকিস্তানী একটা ইউনিভার্সিটি থেকেও একজনের নাম দেখলাম। রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় সাতশো জন পদার্থবিদ।

ঠিক সাড়ে ছটায় শুরু হলো ওয়েলকাম ককটেল রিসেপশান। ইউনিয়ন বিল্ডিং সংলগ্ন খোলা জায়গায়। ডান পাশে পার্কিং স্পট আর রাস্তাটা পেরুলে এডেলেইডের নদী টরেন্স। পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উষ্ণ অভ্যর্থনা। এই রিসেপশানের আয়োজক ইন্সটিটিউট অব ফিজিক্স, ইংল্যান্ড।

হার্ড ড্রিংকসের ফ্রি সরবরাহ থাকলে যা হয়; প্রায় সবাই বীয়ার আর মদের বোতল খালি করছে একটার পর একটা। সোমরসে অনাসক্তদের জন্য আছে অরেঞ্জ জুস। ক্যাটারাররা সবার সামনেই একের পর এক খাদ্য পাত্র তুলে ধরছে। যার যা খুশি তুলে নিচ্ছে পাত্র থেকে। এরকম খাবারের নাম হলো ফিংগার ফুড। আঙুলে ধরে খাওয়া যায় বলেই হয়তো। প্লেট লাগে না, চামচ লাগে না। দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে খাওয়া যায়। নানা রকম খাবারের সমারোহ। একটার পর একটা খাবার এসে দাঁড়াচ্ছে চোখের সামনে। খাবারের টেবিলের কাছে হেঁটে যেতে হচ্ছে না বলে কোন ধরণের লাইন দেখা যাচ্ছে না। সাদা মাংস, লাল মাংস, মাছ, চিংড়ি কত ধরনের ফিশ বল, মিট বল। পার্টিক্যাল থিওরী গ্রুপের ম্যাট নিরামিষ ভোজী। তাদের জন্য শাক পাতা ভর্তি সালাদের ব্যবস্থা আছে। ভাষণ এবং খাওয়া একসাথে চললে যা হয়, কিছু না শুনেই হাততালি দিতে হয়। আমিও হাততালি দিলাম অনেকের সাথে। বক্তারাও জানেন এধরণের অনুষ্ঠানে কেমন ভাষণ দিতে হয়। কোন বক্তৃতাই তাই দুমিনিটের বেশি দীর্ঘ নয়।

নাম ঠিকানা সবার বুকে লেখা আছে। তা দেখে দেখে অনেকেই "হ্যালো প্রাডিব, হাই প্রাডিব করতে লাগলো। আমিও কিছুক্ষণ হাই জন, হ্যালো লিজ, হ্যাল্লো সুশান, হাই টিম করতে করতে হাত মেলালাম আর ''নাইস টু মীট ইউ, সী ইউ এরাউন্ড'' করতে লাগলাম। এসময় সামনে এসে দাঁড়ালো একটা চায়নিজ মেয়ে। উচ্চতায় আমার চেয়ে যথেষ্ট খাটো বলে আমার নামটা পড়ছিলো গলা উঁচু করে। তার নেম ট্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখলাম জিন ওয়াং। এসেছে ইউনিভার্সিটি অব কুইনস্ল্যান্ড থেকে। আমিই আগ বাড়িয়ে কথা বললাম তার সাথে,

- হ্যালো জিন, হাউ আর ইউ? [অস্ট্রেলিয় উচ্চারণে হাউআইয়া?]
- হাই প্রাডিব।
এডেলেইডে বেশ গরম, কুইনসল্যান্ডে মোটামুটি। মেলবোর্ন তেমন গরম নয় ইত্যাদি অর্ধপ্রয়োজনীয় ইতস্তত কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। এক পর্যায়ে সে জানতে চাইলো -
- মেলবোর্নে কতদিন ধরে আছো?
- আড়াই বছর। তুমি কতদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায়?
- সাড়ে তিন বছর।
- তোমার পি-এইচ-ডি শেষ?
- না, লিখছি এখন। আশা করছি মার্চের মধ্যে শেষ হবে।
জানা গেলো জিনের রিসার্চ এরিয়া অপটিক্স।
- তোমার দেশ কোথায়?
এডেলেইডে আসার পর এই প্রথম কেউ জিজ্ঞাসা করলো আমাকে।
- বাংলাদেশ। তোমার?
- চীন। মেলবোর্নে কেমন চায়নিজ আছে?
- অনেক।
- তোমার দেশটি কি আফ্রিকায়?
মোটামুটি একটা ধাক্কা খেলাম আমি। চীনালোক সহজে বাংলাদেশ চিনতে পারে না। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামকেও তারা তাদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ফেলে। গ্রীনল্যান্ডকে বাংলায় অনুবাদ করে আমরা যদি সবুজ ভূমি বলতে আরম্ভ করি, তাহলে যেরকম সমস্যা হবে জিনেরও হয়তো সেরকম সমস্যা হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের চায়নিজ অনুবাদ না বললে সে চিনতে পারবে না। বললাম,
- না, আফ্রিকায় নয়। এশিয়ায়। তোমাদের প্রতিবেশী ইন্ডিয়া আমাদেরও প্রতিবেশী। ধরতে গেলে তোমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিবেশী। আমার দেশের নামের চায়নিজ অনুবাদ পরে জানাবো তোমাকে।
- আসলে আমি ভূগোলে খুব কাঁচা তো।
- ওটা একটা খোঁড়া অজুহাত। বাদ দাও।

বাদ দিতে বললেও বাদ দেয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না জিনের মধ্যে। সে একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলেছে।
- তুমি কোথায় উঠেছো এখানে?
- রয়েল এডেলেইড হাসপাতালের হোস্টেলে।
- কি মজা! আমিও তো এখানে। কত তলায় তুমি?
- দশ।
- আমি এগারো। আমি তোমার উপরে! হিঃহিঃহিঃ।
আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না এখানে হাসার মতো কী আছে। কিন্তু হাসি না পেলেও নাকি ভদ্রতার হাসি হাসতে হয়। হাসলাম। এমনিতেই এখানে সবাই কারণে অকারণে হাসছে। দেখতে পেলাম বিপিনরা এসে ঢুকছে। জিনকে এক্সকিউজ মি বলে বিপিনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বিপিন মানে ডঃ বিপিন ধল। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির পোস্ট ডক্টরেট ফেলো। বিহারের মানুষ। পি-এইচ-ডি করেছেন কোলকাতা থেকে। সংগে এসেছে তার বৌ রাণু। সাথে আরো কয়েকজন মেলবোর্নের ফিজিসিস্ট; এরিক, জন লী, ট্যান ল্যাং, ডেভিড পেটারসন। তারা আটজন মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করে মেলবোর্ন থেকে সোজা ড্রাইভ করে চলে এসেছে। সবে এসে পৌঁছালো। কোথায় থাকবে এখনো ঠিক করতে পারেনি। জন, ট্যান আর রাণুর সাথে 'হ্যালো, হাই' করতে না করতেই জিন এসে হাজির। জিনকে পরিচয় করিয়ে দিলাম জন আর ট্যানের সাথে। জন লী আর ট্যান ল্যাং দুজনই চায়নিজ। চায়নিজ ভাষাতেই আলাপ শুরু করলো তারা। একটু পরেই জানা গেলো ডঃ ট্যান ল্যাং আর জিন ওয়াং দু'জনই চীনে একই ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাস করেছে এবং তাদের দু'জনেরই সুপারভাইজার ছিলেন একই ব্যক্তি। আমি তাদেরকে কথা বলতে দিয়ে এগিয়ে গেলাম ডঃ অঞ্জলি মুখার্জীর দিকে।

ডঃ মুখার্জীর সামনে যেতেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,
- আপনি, মানে তুমিই প্রদীপ? 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করো না। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আরো বড় সড় কেউ হবে।
খুব সহজেই আলাপ জমে গেলো। কন্‌ফারেনস ডেলিগেটদের তালিকায় তাঁর আর ডঃ মহানন্দা দাশগুপ্তার নাম দেখে ঠিকই ভেবেছিলাম তাঁরা বাঙালী হবেন। ভারতীয় বাঙালী। অঞ্জলি মুখার্জী কোলকাতার মেয়ে। সাহা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পি-এইচ-ডি করে গত দেড়বছর যাবত অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পোস্টডক্টরাল ফেলো। তাঁর হাজবেন্ড আছেন কোলকাতায়। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বড় পদে আছেন। তাই তাঁর ছুটি নেই এখানে আসার। অঞ্জলি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে এসেছেন কোলকাতায়। অস্ট্রেলিয়ায় মন টিকছেনা তাঁর, তার ওপর ক্যানবেরার মতো সব অর্থেই ঠান্ডা একটা জায়গায়।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে নিয়ে গেলেন ডঃ মহানন্দা দাশগুপ্তার কাছে। শার্ট আর ঘাগড়া জাতীয় একটা পোশাক পরা থাকলেও চেহারা আর গায়ের রঙের কারণে মহানন্দাকে পুরোপুরি ভারতীয় মেয়েই মনে হচ্ছে। আমি কিছু বলার আগেই তিনি হৈ হৈ করে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। তাঁকে খুব উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছে। আমার সাথে পরিচিত হচ্ছেন বলেই এই উচ্ছ্বাস নয়, তিনি এমনিতেই বেশ প্রাণবন্ত। আমার সাথে বাক্য যা বললেন সব ইংরেজিতে। ইংরেজী কায়দায় আমার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিলেন কয়েকবার। আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম বাংলায় কথা বলার জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি বাঙালী নন। দাশগুপ্ত পদবীতো বাঙালীদের থাকে। আমি কোন কথা না বলে ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম আমার ডানহাতটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে। তিনি দুমিনিট ঝড়ের বেগে কথা বলে, পরে আমার সাথে আরো অনেক কথা বলবেন ইত্যাদি বলে, তাঁকে এখুনি যেতে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করে, অনেকটা ঝড়ের বেগেই চলে গেলেন। তাঁর গতির সাথে আমি কিছুতেই গতি মেলাতে পারছিলাম না। বাঙালী মেয়ের অবয়বে তিনি একজন পুরোদস্তুর অস্ট্রেলিয়ান।

আমি অঞ্জলি মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম,
- তিনি বাঙালী নন?

- পুরোপুরি বাঙালী। এখানে আসলে আট নয় বছর ধরে আছে তো তাই।
জানা গেলো মহানন্দা দাশগুপ্তা টাটা ইনস্টিটিউট থেকে পি-এইচ-ডি করে এদেশে পোস্টডক্টরেট ফেলো হিসেবে এসেছিলেন নয়বছর আগে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। তারপর থেকেই আছেন ওখানে। এক্সপেরিমেন্টাল নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কুইন এলিজাবেথ ফেলো। কুইন এলিজাবেথ ফেলোশিপ পাওয়া সহজ কথা নয়। দারুণ প্রতিভার অধিকারী না হলে এরকম ফেলোশিপ পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না কেউ।
একে একে লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। আজকের মতো আয়োজন শেষ। কাল সকাল থেকে শুরু হবে মূল কর্মযজ্ঞ। আমিও যাবার জন্য পা বাড়ালাম। এসময়
- তুমি কি হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছো?
জিনের প্রশ্ন। সে কখন আমার পিছু নিয়েছে আমি খেয়াল করিনি।
- হ্যাঁ।
- আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি আসলে রাস্তা চিনিনাতো।
- কোন সমস্যা নেই। তুমি এসেছো কবে?
- কাল বিকেলে। আজ সারাদিন বীচে ঘুরেছি। ভীষণ সুন্দর বীচ। তুমি জানো এখানের বীচ কোন্‌দিকে?
মেয়েটা প্রচুর কথা বলে। চায়নিজ উচ্চারণে ইংরেজি। শুনতে হলে বেশ মনযোগ দিতে হয়। আমি অর্ধ-মনযোগ দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম হোস্টেলের দিকে। ব্যাগ রেখে আবার বেরুবো এরকম প্ল্যান আমার।
- তুমি রাতে আর কিছু খাবে না?
এরকম প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলাম না মোটেও। আমি কিছু বলার আগেই জিন বললো -
- আমি ভেবেছিলাম এখানে ডিনার করাবে। তা না, কেবল টুকটাক খাওয়া!
এই টুকটাক খাওয়া কিন্তু পরিমাণে কম নয়। আমার পেট ভর্তি হয়ে গেছে। অথচ এই পুচকে মেয়েটার পেটে এখনো ক্ষুধা আছে! আশ্চর্য তো। বললাম,
- এর চেয়ে ভালো ডিনার এখানে আর কী করাবে। ফুল কোর্স ডিনার তো আর সবদিন করানো যাবে না।
- আমার পেট ভরেনি। তুমি খাবারের দোকান চেনো এখানে?
- চিনি। কিন্তু আমার মনে হয় এতোক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে।
- চলনা, গিয়ে দেখি। আমি একাই যেতাম। কিন্তু পথ চিনিনাতো। তোমার কোন কাজ নেই তো এখন?
জিনের কথায় কোন ধরনের ফর্মালিটির বালাই নেই। এমন ভাবে কথা বলছে যেন সে জানেই আমি তার সাথে যেতে আপত্তি করবো না আর আমার কোন কাজ থাকলেও তা ড্রপ করবো এখন। আমার আসলেই কোন কাজ নেই এখন। তাই আপত্তি করলাম না। দেখা যাক মেয়েটার খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান করা যায় কিনা। হোস্টেলে না গিয়ে সিটির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

খাবারের দোকান সহ শহরের প্রায় সব দোকান বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু রেস্টুরেন্ট খোলা আছে। কিন্তু জিন সেখানে ঢুকতে রাজি নয়, কারণ ডিনারের জন্য এত বেশি খরচ করতে সে পারবে না। শেষে একটা খাবারের গাড়ি পাওয়া গেলো। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে

স্যান্ডুইচ বিক্রি করছে। জিন খুশি মনে দুটো স্যান্ডুইচ কিনলো। আমিও ভদ্রতার খাতিরে একটা কিনলাম। স্যান্ডুইচের বিশাল আকৃতি দেখে আমি ভাবছিলাম জিন দুটো স্যান্ডুইচ শেষ করবে কীভাবে? কিন্তু আমাকে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। কিছুদূর হেঁটে পার্লামেন্ট হাউজের বারান্দায় এসে বসতে বসতেই তার একটা স্যান্ডুইচ শেষ। আমারটার মোড়কও খুলিনি তখনো।

নর্থ ট্যারেস আর কিং উইলিয়াম স্ট্রিটের কোণায় এই পার্লামেন্ট ভবন। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার স্টেট পার্লামেন্ট হাউজ। গ্রানাইট পাথরের বিরাট বিরাট দশটি পিলার শোভা পাচ্ছে বারান্দাজুড়ে। শক্ত কালো পাথরের সিঁড়িতে বসে উপরের দিকে তাঁকিয়ে দেখছিলাম এর কারুকাজ। সিঁড়ির পাশে দেয়ালে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা রয়েছে। এই ভবনটার দুটো অংশ। পশ্চিম অংশ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিলো ১৮৮৩ সালে। শেষ হয়েছে ১৯৩৯ সালে। আর পূর্ব অংশের কাজ শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৮৯ সালে। এতো দীর্ঘ সময় কেন লাগলো তা আমি জানিনা। আর বিলডিংটাও এমন কিছু অসাধারণ নয় যে এতদিন লাগবে। পুরোনো পার্লামেন্ট হাউজটাও এখনো পাশেই আছে।

রাস্তার আলো জ্বলেছে অনেক আগেই। এখনো দিনের আলো আছে। রাস্তাগুলো বিশাল চওড়া এখানে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলাম। হঠাৎ জিনের প্রশ্নে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ জিনের অস্তিত্বও ভুলে গিয়েছিলাম আমি।
- তোমার টপিকটা কী?
- পি-এইচ-ডি টপিক নাকি এখানে কী নিয়ে বলবো সেটা?
- দু'টোই।
এবার আমার গবেষণা সম্পর্কে কিছুক্ষণ কথা হলো। জানতে চাইলাম তার কাজ সম্পর্কে। বলতে বলতে সে জানালো অস্ট্রেলিয়াকে তার মোটেও পছন্দ নয়। কারণ তার মতে অস্ট্রেলিয়া খুব একটা গতিশীল নয়। সে গতি পছন্দ করে। যেমন রয়েছে আমেরিকার। চার সপ্তাহের জন্য সে গিয়েছিলো নিউইয়র্কে। গতবছর। পি-এইচ-ডি শেষ করে আবারো যাবার ইচ্ছা। এখন থেকেই চেষ্টা করছে। কারণ সেখানে টাকা উপার্জন করা কোন ব্যাপার নয়। এবং আমি যদি টাকা উপার্জন করতে চাই তাহলে অবশ্যই তার কথা শোনা উচিত। অবশ্যই আমেরিকা যাওয়া উচিত।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি জিনের কথা। সে কথা বলতে ভালোবাসে, বলুক।
- আমি ভাবছি আমার সাবজেক্ট চেঞ্জ করে ফেলবো। আই টি'র বাজার এখন খুব ভালো। তুমি কী বলো?
এই প্রশ্ন আসলে কথা বলার একটা অংশ। আমার উত্তরে কিছু যায় আসেনা। তাই চুপ করে থাকলাম। সে বলেই চলেছে,
- একজন আই টি'র লোক এখন বছরে কমপক্ষে একশ হাজার ডলার বেতন পায়। ইউ এস ডলার। আর একজন ফিজিসিস্ট?
আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম,
- সব কিছুকে টাকার হিসেবে বিচার করা উচিত নয়। যারা গবেষণা করে তারা মূলত ভালো

লাগে বলে করে, ভালোবাসে বলেই করে। সেখানে টাকাটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু মুখ্য নয়।
- ভালোবাসা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই বলেই তুমি একথা বলছো। ভালোবাসার মূল কথা হচ্ছে গিভ এন্ড টেক পলিসি।
ভালোবাসার এরকম জেনারালাইজেশান মেনে নেয়া যায়না।
- অবজেক্শানস্। সব ভালোবাসা গিভ এন্ড টেক পলিসি নয়। ভালোবাসার মূল কথা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস এন্ড কমিটমেন্ট। এ দু'টো না থাকলে কোন ভালোবাসাই সম্পূর্ণ নয়।
তর্ক লেগে যেতে দেরী হলোনা। জিন মানতেই চায় না যে অনেক ভালোবাসায় রেসিপ্রোসিটির স্থান নেই। তার কথা হলো,
- তুমি যা চাচ্ছো, তা যদি তোমার ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে না পাও, তাকে বদলে ফেলো। অলস লোকেরাই শুধু সেক্রিফাইস করে।

সে যুক্তির কোন ধার ধারছেনা। তার ভাবখানা এই, বাবা মাও যদি তার আশা পূরণ করতে না পারে তবে তাদেরকেও সে চেঞ্জ করে ফেলবে। বললাম,
- যে বিষয়ে তুমি পি-এইচ-ডি করছো সে বিষয়টার বাজার দরের ভিত্তিতে তুমি কাজ করবে আর বাজার দর কমে গেলে বিষয় বদলাবে তাতো সবসময় সত্যি নয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তো একই রকম ব্যাপার। যাকে সত্যিকারের ভালোবাসো তার জন্য সামান্য স্যাক্রিফাইস তুমি যদি নাই করো, তাহলে কিসের ভালোবাসার কথা বলো তুমি?
- তোমার মতো এরকম ছেলেমানুষী ভাবনা তোমার বয়সে আমিও ভাবতাম। এখন আর ভাবিনা। বয়স বাড়লে তুমিও তোমার ভাবনা বদলাতে বাধ্য হবে।
আমার মুখে আর কথা জোগালো না। চায়নিজদের বয়স সহজে বোঝা যায় না। জিনের বয়স তেইশ থেকে তেতাল্লিশ যে কোনটাই হতে পারে। কিন্তু আমাকে একেবারে ছেলেমানুষ ভাবার তো কোন কারণ নেই। মানুষের বয়সটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে এ সম্পর্কে আর কিছু বললাম না। জিন বলেই চলেছে,
- আমি তোমার যুক্তিগুলোর বিপরীতে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা। কিন্তু তোমার যুক্তি আমি মেনেও নিচ্ছি না। আদর্শ ভালো জিনিস। কিন্তু শুধু আদর্শ দিয়ে জীবন চলে না।
আমার আর তর্ক করতে ইচ্ছে করছেনা। বললাম,
- এবার ফেরা যাক।
- চলো।
ফেরার পথেও সে সারাক্ষণ বক বক করেছে। আমি শুধু হ্যাঁ হুঁ করে গেছি। সে রাস্তা চেনে না বলেছিলো। কিন্তু এখন রাতের বেলাতেও দেখি সে একবারও রাস্তা সম্পর্কে কিছুই না জিজ্ঞেস করে যেখানে বাঁক নেবার ঠিক সেখানেই বাঁক নিয়ে, যেখানে রাস্তা পেরুবার সেখানেই রাস্তা পার হয়ে হোস্টেলে ফিরেছে। দশতলার লিফ্ট থামলে সে হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি তার হাতটা সামান্য ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললাম,
- গুডনাইট।